চন্দ্রনাথ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সারকুলার রোডের সমাধিক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রনাথের কথাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম। কত কথা মনে হইতেছে! দীর্ঘ এত দিনের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে কয়টি পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ গভীর রাত্রির মধ্যগগনচারী কালপুরুষ নক্ষত্রের মতো দীপ্তিতে পরিধিতে, প্রদীপ্ত ও প্রধান হইয়া আছে। কালপুরুষ নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। ওই নক্ষত্রটির খড়্গধারী ভীমকায় আকৃতির সঙ্গে চন্দ্রনাথের আকৃতির যেন একটা সাদৃশ্য আছে। এমনই দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেও আপনার জীবনের কক্ষপথে চলিয়াছে, একদিন পিছনে ফিরিয়া চাহিল না, ক্ষণিক বিশ্রাম করিল না, যাহাকে কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার এ উন্মত্ত যাত্রা তাহাকে আজও পাইল না, তবু সে চলিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনকে মনে পড়িতেছে—হীরুকে।

চন্দ্রনাথ, হীরু, আমি সহপাঠী। আরও একজনকে মনে পড়িতেছে—চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথবাবুকে। কেমন করিয়া যে এই তিনজন একই সময়ে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু

বিস্ময় প্রকাশ করিব না। আগ্নেয়গিরি গর্ভের মধ্যে কল্পনাতীত বিচিত্র সমাবেশে যত কিছু প্রলয়ংকর দাহ্য বস্তু সমাবিষ্ট হয় কী করিয়া! এও হয়তো সেই বিচিত্র সমাবেশ।

ঘরে কেহ নাই। টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা অকম্পিত প্রদীপ্ত জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। আলোকিত কক্ষের মধ্যে একা বসিয়া চন্দ্রনাথ, হীরু ও নিশানাথকে ভাবিতেছি। সম্মুখেই দেওয়ালে বিলম্বিত বড়ো আয়নাটির মধ্যে আমারই প্রতিবিম্ব আমার দিকে চিন্তাকুল নেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে। অলীক কায়াময় ছায়া, তবু সে আমার এই স্মৃতি-স্মরণে বাধা দিয়া তাহারই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। আলোটা নিভাইয়া দিলাম। মুহূর্তে ঘরখানা প্রগাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল।

অতীতের রূপ এই অন্ধকার। আলোকিত যে দিবসটি অবসান হইয়া তমসা-পারাবারের মধ্যে ডুব দিল, আর সে তো আলোকিত প্রত্যক্ষের মধ্যে ফেরে না। তাই অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতেছি। সে দেখা দিল। অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল কিশোর চন্দ্রনাথ। দীর্ঘাকৃতি সবল সুস্থ দেহ নির্ভীক দৃষ্টি কিশোর। অসাধারণ তাহার মুখাকৃতি; প্রথমেই চোখে পড়ে চন্দ্রনাথের অদ্ভুত মোটা নাক; সামান্য মাত্র চাঞ্চল্যেই নাসিকাপ্রান্ত স্ফীত হইয়া ওঠে। বড়ো বড়ো চোখ, চওড়া কপাল, আর সেই কপালে ঠিক মধ্যস্থলে শিরায় রচিত এক ত্রিশূল-চিহ্ন। এই কিশোর বয়সেও চন্দ্রনাথের ললাটে শিরার চিহ্ন দেখা যায়। সামান্য উত্তেজনায় রক্তের চাপ ঈষৎ প্রবল হইলেই নাকের ঠিক উপরেই মধ্য-ললাটের ওই ত্রিশূল-চিহ্ন মোটা হইয়া ফুলিয়া ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টারমহাশয়কে মনে পড়িতেছে। শীর্ণ দীর্ঘকায় শান্তপ্রকৃতির মানুষটি—ওই যে বোর্ডিং-এর ফটকের সম্মুখেই চেয়ার-বেঞ্চের আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। হুঁকাটি হাতে ধরাই আছে। চিন্তাকুল বিমর্ষ নেত্রে আমাকে বলিলেন—নরু, তুমি একবার জেনে এসো তো চন্দ্রনাথ কী বলে!

দুর্দান্ত চন্দ্রনাথের আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময়; চন্দ্রনাথ প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্র দিয়াছে। সেকেন্ড প্রাইজ সে গ্রহণ করিতে চায় না। সে আজ পর্যন্ত কখনও সেকেন্ড হয় নাই। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারিলাম না।

চন্দ্রনাথের কাছেই গেলাম। দারিদ্র্য-জীর্ণ স্বল্পালোকিত চন্দ্রনাথের ঘরখানার মধ্যে চন্দ্রনাথ বসিয়া আপন মনে কী লিখিতেছিল। তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে লিখিতেই থাকিল, কোনো অভ্যর্থনা করিল না; সে তাহার স্বভাব নয়। আমি নিজেই বসিয়া প্রশ্ন করিলাম, কী লিখছিস?

লিখিতে-লিখিতেই চন্দ্রনাথ উত্তর দিল, ইউনিভার্সিটি এগ্‌জামিনের রেজাল্ট তৈরি করছি। কে কত নম্বর পাবে তাই দেখছি।

তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। চন্দ্রনাথ আরও খানিকটা লিখিয়া কাগজখানা আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখ।

কাগজটায় চোখ বুলাইতেছিলাম। চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, আমার যদি সাড়ে-পাঁচশো কী তার বেশি ওঠে, তবে স্কুলের এই রেজাল্ট হবে—মানে দুটো ফেল, অমিয় আর শ্যামা; তা ছাড়া সব পাশ হবে। আর আমার যদি পাঁচশো-পঁচিশের নীচে হয়, তবে দশটা ফেল; তুই তাহলে থার্ড ডিভিশনে যাবি।

বেশ মনে পড়িতেছে, তাহার কথা শুনিয়া রাগ হইয়াছিল। এই দাম্ভিকটা যেন ফেল হয়—এ কামনাও বোধ হয় করিয়াছিলাম।

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, তুই বোধ হয় রাগ করছিস? কিন্তু অনুপাতের আঙ্কিক নিয়মে যার মূল্য যতবার কষে দেখবে, একই হবে। একের মূল্য কমে, সকলের কমবে। দিস ইজ ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স।

আমি এইবার কথাটা পাড়িব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু সে হইল না। চন্দ্রনাথের দাদা একখানা পত্র হাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথের হাতে পত্রখানা দিয়া বলিলেন, এ কী!

পত্রখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া চন্দ্রনাথ অসংকোচে বলিল, আমি সেকেন্ড প্রাইজ রিফিউজ করেছি।

কারণ?

কারণ? চন্দ্রনাথের নাসিকাপ্রান্ত স্ফীত হইয়া উঠিল, ললাটে শিরায় রচিত ত্রিশূল-চিহ্ন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল— কারণ, সেকেন্ড প্রাইজ নেওয়া আমি বিনিথ মাই ডিগ্‌নিটি বলে মনে করি।

চন্দ্রনাথের দাদা ক্ষোভে যেন কাঁপিতেছিলেন, বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, কথাটা বলতে তোমার লজ্জায় বাধল না? ডিগ্‌নিটি! একে তুমি ডিগ্‌নিটি বল? তোমার অক্ষমতার অপরাধ!

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, তুমি জান না দাদা।

কী জানি না? জানবার এতে আছে কী?

স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো ফার্স্ট হয়েছে, সে আমারই সাহায্যে হয়েছে। আর ওর যে প্রাইভেট মাস্টার—স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার—তিনি, কী বলব, প্রশ্নপত্র ছাত্রটির কাছে গোপন রাখেননি। তারও ওপর উত্তর বিচারের সময় ইচ্ছাকৃত ভুলও করেছেন তিনি এবং আরও দু-একজন।

চন্দ্রনাথের দাদার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। ভদ্রলোক নির্বিরোধী শান্তপ্রকৃতির মানুষ। তিনি অবাক হইয়া চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চন্দ্রনাথ বলিল, অঙ্কের পরীক্ষার দিন সে আমায় মিনতি করলে, আমি তাকে তিনটে অঙ্ক আমার খাতা থেকে টুকতে দিলাম। মাস্টার পূর্বে বলে দেওয়া সত্ত্বেও সে সময় তার মনে ছিল না।

চন্দ্রনাথের দাদা গম্ভীর এবং ধীর কণ্ঠস্বরে বলিলেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করে ফল নেই। তুমি ওই পত্র প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমা চেয়ে হেডমাস্টার মহাশয়কে পত্র লেখো, বুঝলে?

চন্দ্রনাথ বলিল, না।

কঠোরতর-স্বরে চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তোমায় করতে হবে।

না।

না? চন্দ্রনাথের দাদা যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন এবার।

না।

করবে না?—ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর এবার কাঁপিতেছিল।

না।

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তোমার বউদি বলত, আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তুমি এতদূর স্বাধীন হয়েছ? ভালো, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সংস্রব রইল না। আজ থেকে আমরা পৃথক।

অবিচলিত কণ্ঠস্বরে চন্দ্রনাথ বলিল, বেশ।

চন্দ্রনাথের দাদা নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি নিশ্চয়ই এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, বিশেষ এমন সংযত নিরুচ্ছ্বসিত কণ্ঠের উত্তর। আমি বেশ বুঝিলাম, ভদ্রলোক আত্মসংবরণের জন্য বিপুল প্রয়াস করিতেছেন। দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, চোখের দৃষ্টিতে বেদনা ও ক্রোধের সে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এমন বুকে দাগ কাটা দৃষ্টি আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখিয়াছি। এক মুহূর্তেও যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দাদা মুখ তুলিয়া সম্মুখের জানালার ভিতর দিয়া আখড়ার তমালগাছটার দিকে চাহিলেন। কাকের কোলাহল চলিয়াছে সেখানে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ো কষ্ট হইল। আজও এই অন্ধকারের মধ্যে আমি চোখ মুদিলাম।

বোর্ডিং-এ আসিয়া মাস্টারমহাশয়কে সংবাদটা দিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও সেই তেমনই একা চিন্তাকুল নেত্রে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, কী হলো নরু, সে কী বললে?

তাঁহাকে অকপটেই সমস্ত বলিলাম। তিনি হুঁকাটি হাতে ধরিয়াই নীরবে বসিয়া রহিলেন।

মাস্টারমহাশয় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, আমি একবার যাব নরেশ? কী বলো তুমি? চন্দ্রনাথের কাছে? না না, পৃথক হবে কেন? নাঃ, ছি!

আমি বলিলাম, না স্যার, আপনি যাবেন না। যদি কথা না শোনে?

শুনবে না, আমার কথা শুনবে না? মাস্টারমহাশয়ের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি উত্তর দিলাম না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মাস্টারমহাশয় বলিলেন, আমারই অন্যায় হলো। চন্দ্রনাথের দাদাকে না জানালেই হতো। না, ছি ছি ছি!

আমি চলিয়া আসিতেছিলাম, তিনি আবার ডাকিলেন, তুমি বলছো নরেশ, আমার যাওয়া ঠিক হবে না, চন্দ্রনাথ আমার কথা শুনবে না?

আমি নীরবেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

দিন দুই পর শুনিলাম চন্দ্রনাথ সত্যই দাদার সহিত পৃথক হইয়াছে। চন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিলাম, সে বলিল, পৃথক মানে কী? সম্পত্তি তো কিছুই ছিল না, মাত্র বাড়িখানা আর বিঘে কয় জমি, কিছু বাসন। সে ভাগ হয়ে গেল। আমাকে তো এইবার নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হতো, এ ভালোই হলো।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বোধ হয় সেদিন সে সময়ে ভাবিয়াছিলাম, চন্দ্রনাথের সহিত সংস্রব রাখিব না। মনে মনে সংকল্পটা দৃঢ় করিতেছিলাম।

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, হীরু এসেছিল আজ আমার কাছে। বলে, কাকা বলছেন তোমাকে তিনি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেবেন।

হীরুই সেবার ফার্স্ট হইয়াছিল—আমাদের স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কী বললি তুই?

চন্দ্রনাথ বলিল, তার কাকাকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠালাম, আর বলে দিলাম, একান্ত দুঃখিত আমি, সে গ্রহণ করতে আমি পারি না। এই প্রস্তাবই আমার পক্ষে অপমানজনক।

চন্দ্রনাথের মুখের দিকেই চাহিয়া ছিলাম। সে আবার বলিল, হেডমাস্টারমশায়ও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকেও উত্তর দিয়ে দিলাম, গুরুদক্ষিণার যুগ আর নেই। স্কুলের সঙ্গে দেনা-পাওনা আমার মিটে আছে, দু-তিন মাসের মাইনে বাড়তি দিয়ে এসেছি আমি। সুতরাং যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার।

সেই মুহূর্তে উঠিয়া আসিলাম।

দুই

ইহার পরই আমি চলিয়া গেলাম মামার বাড়ি। পরীক্ষার খবর বাহির হইলে হীরুর পত্র পাইয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম, চন্দ্রনাথের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। হীরু কলিকাতা হইতে দীর্ঘ পত্রে সমস্ত ফলাফল জানাইয়াছে। দেখিলাম, দশটি ছেলে ফেল হইয়াছে, আমি তৃতীয় বিভাগেই কোনোরূপে পাশ হইয়া গিয়াছি, চন্দ্রনাথও পাঁচশো-পঁচিশ পায় নাই। কিন্তু একটি শুধু মেলে নাই—হীরু চন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। হীরু লিখিয়াছে, সে স্কলারশিপ্ পাইবে। মনে মনে দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না, সত্য বলিতে কী, চন্দ্রনাথ ও হীরুতে অনেক প্রভেদ! চন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বে আমার অন্তত সন্দেহ ছিল না। অপরাহ্ণে পাঁচটার ট্রেনে মামার বাড়ি হইতে ফিরিয়াই সঙ্গে সঙ্গে হীরুর বাড়িতে প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। হীরু স্কলারশিপ্ পাইবে, তাহারই প্রীতিভোজ।

আমি কিন্তু প্রথমেই গেলাম চন্দ্রনাথের বাড়ি। নির্জন বাড়িখানা খাঁ খাঁ করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই, শয়নঘরখানারও দুয়ার বন্ধ, কড়ায় একটা অতি সামান্য দামের তালা ঝুলিতেছে।

সন্ধ্যায় হীরুর বাড়ি গেলাম। উৎসবের বিপুল সমারোহ সেখানে। হীরু ধনীর সন্তান, অর্থের অভাব নাই; চিনা লণ্ঠন ও রঙিন কাগজের মালার নিপুণ বিন্যাসে তাহাদের বাড়ির পাশের আমবাগানটার সে শোভা আজও আমার মনে আছে। হীরুর কাকা শৌখিন ধনীসন্তান বলিয়া জেলার মধ্যে খ্যাতি ছিল, তিনি নিজে সেদিন বাগানটাকে সাজাইয়াছিলেন। বিশিষ্ট অতিথিও অনেক ছিলেন, জনদুয়েক ডেপুটি, ডি. এস. পি., স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার, থানার দারোগা, তাহা ছাড়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোকজন সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন।

হীরুকে স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, লাবণ্যময় দেহ, আয়ত কোমল চোখে মোহময় দৃষ্টি। হীরুর কথা মনে করিয়া আকাশের দিকে চাহিলে, মনে পড়ে শুকতারা। অমনই প্রদীপ্ত, কিন্তু সে দীপ্তি কোমল স্নিগ্ধ।

হীরু পরম সমাদর করিয়া আমাকে বসাইল। নানা কথার মধ্যে সে বলিল, কাকা বলছিলেন, এখন থেকে আই সি. এস.-এর জন্যে তৈরি হও। বিলেতে যেতে হবে আমাকে। বিলেতে যাবার আমার বড়ো সাধ, নরু।

আমার কিন্তু বারবার মনে পড়িতেছিল চন্দ্রনাথকে। কিন্তু সেদিন সেখানে তাহার কথা আমি তুলিতে পারি নাই। হীরুই বলিল, আজই দুপুরে সে চলে গেল। আমি তার আগেই তাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, তবুও সে চলে গেল! একটা দিন থেকে গেলে কী হতো?

হীরু বলিল, মাস্টারমশায়—মাস্টারমশায়।

সচেতন হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, শীর্ণকায় দীর্ঘাকার মানুষটি এন্ডির চাদরখানি গায়ে দিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

হাসিয়া মাস্টারমহাশয় বলিলেন, আজই এলে নরেশ?

মাস্টারমহাশয়ের ওইটুকু এক বিশেষত্ব, ছাত্র তাঁহার অধিকারের গণ্ডি পার হইলেই সে আর 'তুই' নয়, তখন সে 'তুমি' হইয়া যায় তাঁহার কাছে।

তিনি আবার বলিলেন, তুমি পড়বে নিশ্চয় নরেশ। কিন্তু সাহিত্যচর্চাটা পড়ার সময় একটু কম করো বাবা। তবে ছেড়ো না, ও একটা বড়ো জিনিস। জেনো, Shame in crowd but solitary pride হওয়াই উচিত ও বস্তু।

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। হীরু বলিল, নরুর লেখা যে কাগজে বেরিয়েছে এবার স্যার।

হ্যাঁ? বেশ, বেশ। আমাকে লেখাটা দেখাবে তো নরেশ, পড়ব আমি।

তারপর আমাকে প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্রনাথ কোথায় গেল, কাউকে বলে গেল না? তোমাকেও কি কিছু জানিয়ে যায়নি—পত্র-টত্র লিখে?

বলিলাম, না স্যার, কাউকেই সে কিছু জানিয়ে যায়নি।

লাঠির উপর ভর দিয়া মাস্টারমহাশয় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কী যেন তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। আমরাও নীরব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাস্টারমহাশয় নীরবেই চলিয়া গেলেন, আমরা আবার বসিলাম।

হীরু বলিল, চন্দ্রনাথ একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। দেখবি?

চিঠিখানা দেখিলাম, সে লিখিয়াছে—

প্রিয়বরেষু, (প্রিয়বরেষু কাটিয়া লিখিয়াছে) প্রীতিভাজনেষু,

আজই আমার যাত্রার দিন, সুতরাং থাকিবার উপায় নাই, আমাকে মার্জনা করিও। তোমার সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু একটা কথা বারবার মনে হইতেছে, এ উৎসবটা না করিলেই পারিতে। স্কলারশিপটা কী এমন বড়ো জিনিস! ভালোবাসা জানিবে। ইতি— চন্দ্রনাথ

চিঠিখানা হীরুকে ফিরাইয়া দিলাম। হীরু বলিল, চিঠিখানা রেখে দিলাম আমি। থাক, এইটেই আমার কাছে তার স্মৃতিচিহ্ন।

সে আবার প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কোথায় গেল সে? করবেই বা কী?

সে যেন নিজেও এ কথা চিন্তা করিয়া দেখিতেছিল!

উত্তর দিয়াছিলাম, জানি না।

কিন্তু কল্পনা করিয়াছিলাম, কিশোর চন্দ্রনাথ কাঁধে লাঠির প্রান্তে পোঁটলা বাঁধিয়া সেই রাত্রেই জনহীন পথে একা চলিয়াছে। দুই পাশে ধীর মন্থর গতিতে প্রান্তর যেন পিছনের দিকে চলিয়াছে, মাথার উপরে গভীর নীল আকাশে ছায়াপথ, পার্শ্বে কালপুরুষ নক্ষত্র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)